দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 31. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬ ......

২৬৭

শিক্ষার মান শিক্ষার্থীদের কার্যকলাপ ঃ ভাবনার দায়িত্ব কার—

ইউসুফ শরীফ

[illegible] উপর রাজনৈতিক প্রভাব শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অনুকূল পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারবার আলোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণ নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকতো বটেই, জনগণও এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। কেননা, শিক্ষাঙ্গনের এই পরিস্থিতির দরুন দেশে শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের একাংশের কার্যকলাপ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠেছে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের দাবীও ওঠেছে। খোদ প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত এই অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতি তুলে ধরে এই দাবী উচ্চারণ করছেন বারবার। কিন্তু, তাতেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে যে ঘটবে, তেমন কোনো আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গত কারণেই আজ মনে হচ্ছে, এদেশে আর যাই হোক শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না এবং শিক্ষার মানেরও কোনো উন্নতি ঘটবে না। তাহলে কি হবে? এ প্রশ্নের জবাব রীতিমতো ভয়ঙ্কর। সাধারণ নিরীহ ছাত্ররাও যখন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে রাজনৈতিক দলের প্রভাবে নিজেদের সঁপে দিয়ে প্রচলিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হবে, তখন পরিস্থিতি কি হবে তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই আশংকার কথা ভেবে সামর্থ্যবানরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। প্রতিমাসে বৈদেশিক মুদ্রায় কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে তাদের জন্য। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভাবলে, এটা বাংলাদেশের জন্য নিছক বিলাসিতা। দূরদৃষ্টিহীন নির্বোধ লোকেরাই এরকম বিলাসিতায় লিপ্ত হতে পারে—একথা যে কেউ বলবেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। যারা ছেলেমেয়েকে বিদেশে পড়তে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছেন, তাদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। কেননা, প্রশ্ন থাকলে তারা সন্তানদের বিদেশে পড়তে পাঠানোর আগে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা বিষয়টি ভেবে দেখতেন। আর ভেবে দেখলে তারা শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত এবং শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সরিয়ে রাখার কার্যকর উদ্যোগ নিতেন। যাহোক, প্রশ্নটি হল, যে ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়াশোনা করছে, পড়াশোনা শেষ করে তারা কি দেশে ফিরে আসবে? এ প্রশ্ন এজন্যই যে, তারা যদি দেশেই ফিরে আসে তাহলে তাদেরকে কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে কর্মজীবন শুরু করতে হবে। তারা বিদেশে যে পরিবেশে যে শিক্ষালাভ করে ফিরে আসবে, দেশে এসে সে ধরনের পরিবেশ পাবে না এবং অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কোনো সুযোগও পাবে না। দেশে শিক্ষাঙ্গনের অশান্ত পরিবেশে অসুস্থ কার্যকলাপে নিয়োজিত থেকে নিম্নমানের শিক্ষা যারা লাভ করবে, তাদের সাথে বিদেশে উঁচু মানের শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীটির দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠবে। এই অবস্থায় বিদেশে শিক্ষিতরা যে প্রথম সুযোগেই ফের বিদেশে পাড়ি জমাবে এটা একমত নিশ্চিত। ফলে, এদেশটিতে মানুষের মনে আঁধার ও পরিবেশে যে আবিলতা জমছে তা আরো ঘন কালো হয়ে ওঠবে এবং দেশটি বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের শেষ সীমায় গিয়ে ঠেকবে। এটা নিছক হতাশাবাদীদের ব্যাখ্যা নয়, দেশে আজকের বাস্তবতা এই উদ্বেগ ও আশংকাকেই ক্রমাগত স্পষ্ট করে তুলছে। কাজেই, বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশোনার জন্য আজ যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে তা কোনো দিনই দেশের কোনো মঙ্গলে লাগবে না। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ আমরা ইচ্ছে করেই আনিনি। যে কোমলমতি ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়ছে, তারা দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধে কতটা স্থিত থাকতে পারবে শেষ পর্যন্ত? যেসব দেশে তারা পড়াশোনা করছে সেসব দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ কি অতি সহজেই তাদের কোমল মন ও মগজে স্থান করে নেবে না? ফলে তাদের কেউ কেউ হয়তো দেশেই ফিরতে চাইবে না পাকাপাকিভাবে। আর যারা ফিরে আসবে তারা নিজেরাই এদেশের সমাজে মিসফিট হয়ে পড়বে।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা অনুপ্রবেশের সাথে যারা জড়িত, খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে, তাদের অধিকাংশের সন্তানরাই হয় বিদেশে পড়াশোনা করছে, না হয় দেশের ভেতরই কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজী মিডিয়ামে পড়াশোনা করে বিদেশে উচ্চতর পড়াশোনা করার জন্য তৈরী হচ্ছে। কাজেই, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস জেঁকে বসা, শিক্ষার্থীদের একাংশের অনাকাংক্ষিত কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়া ইত্যাদি ভয়ংকর বিষয়গুলোও তাদের জন্য কোনো দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারছে না। এদেশে বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত একটি শ্রেণীকে অনেক ব্যাপারেই অত্যন্ত সরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অতি উৎসাহও গোপন থাকে না। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও রাজনীতিমুক্ত করার যে দাবী দেশের মানুষের দাবী এবং দেশের প্রেসিডেন্ট প্রসঙ্গ এলেই উচ্চারণ করছেন, বারবার উচ্চারণ করছেন—সময়ের এই দাবীর ব্যাপারে তারা অনেকটাই নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত। এটা বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে, কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন কোনো বিষয়ে এই বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন না। এর কারণ শিক্ষার্থীদের একাংশ, যেমন রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ও রাজনীতির আবিলতায় নিমজ্জিত, এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটিও তেমনি রাজনীতির গ্রাসে নিপতিতও। অথচ, এদেরই একাংশ আবার এনজিওদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইদানীং সিভিল সোসাইটির নামে তৎপর হয়ে ওঠেছেন। রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বা প্রভাবিত অর্থাৎ রাজনীতির ননী-মাখন-ভোগী কোনো শ্রেণীর দ্বারা যে সিভিল সোসাইটি গঠিত হতে পারে না এবং হলেও তা সত্যিকার সিভিল সোসাইটির ভূমিকা পালন করতে পারে না—এটা বোঝার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের দরকার নেই। যাহোক, আমরা বলছিলাম শিক্ষা, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে এই একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর নিরাসক্ত ভূমিকার কথা। এই নিরাসক্তি যে রাজনৈতিক স্বার্থপ্রসূত তা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য, এই বুদ্ধিজীবীদেরও অধিকাংশের ছেলেমেয়েরা দেশীয় শিক্ষাঙ্গনের আবিলতা ও শিক্ষা-মানের ক্রমাবনতির উর্ধ্বে। কেননা, তাদের বিদেশে পড়ানোর মতো আর্থিক যোগ্যতা এবং সুযোগ-সুবিধা পিতা-মাতাদের রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই যোগ্যতা ও সুযোগ-সুবিধা লাভের কারণেই এদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী সত্যিকার বুদ্ধিজীবীসুলভ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেন না। একই কথা প্রযোজ্য একশ্রেণীর আমলাদের সম্পর্কেও। এদেশের অনেক ক্ষুদে আমলার সন্তানরাও বিদেশে, ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত রয়েছে। কাজেই, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে দ্রুত অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে এ নিয়ে তাদেরও কোনো মাথাব্যথা নেই। সম্প্রতি স্কাউটস কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত স্কাউটিংয়ের অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানো এবং ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তুলে প্রার্থিত জাতীয় অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে স্কাউট আন্দোলন। বলার অপেক্ষা রাখে না, স্কাউটিং সত্যিকার একটি আশার আলো হয়ে ওঠতে পারে শিক্ষার্থীদের জন্য, জাতির জন্য। কেননা, আরো অনেক বিষয়ের সাথে স্কাউটদের শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। সর্বোপরি, মানুষ যে মানুষের জন্য—মানব কল্যাণের এই 'সার কথাটির বাস্তব অনুশীলনেও উদ্বুদ্ধ করে তাদের। বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের অবস্থাটা কি—এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট যে তাগিদ দিয়েছেন তা উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। দেশে স্কাউটের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এটাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তার গুণগত মানও বাড়াতে হবে। এতে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশে স্কাউটিংয়ের মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্কাউটিংয়ের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিবন্ধকতা বা শৈথিল্য থাকা বিচিত্র নয়। তবে, সাধারণ মানুষের কাছে বরাবরই এ প্রশ্নটি জেগেছে যে, স্কাউটিং যেখানে প্রধানতঃ শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেখানে বর্তমান ও সাবেক আমলাদের এতো ভিড় কেন? শীর্ষ অবস্থানগুলোতেও দেখা যায়, আমলারাই অধিষ্ঠিত থাকেন। শিক্ষক বা শিক্ষাবিদরা বোধ হয় সামনের সারির দিকে বিশেষ এগোতে পারেন না। এর ভেতরে কি এমন কারণ রয়েছে জানি না। তবে স্কাউটিং যেহেতু শিক্ষাঙ্গনের বিষয় সেহেতু এর শীর্ষ নেতৃত্ব যে শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের মধ্যে থাকা দরকার—এটা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এমনওতো হতে পারে যে, এই জটিলতার কারণেই দেশের স্কাউট আন্দোলন আশানুরূপ এগোতে পারছে না। আসলে যার যা নয়, তা-ই করাটা জাতি হিসেবে আমাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্ভাবনাময় উদ্যোগও সহজে সুফল বয়ে আনতে পারবে না। শিক্ষাঙ্গনেও এটাই ঘটছে। ছাত্রদের কাজ পড়াশোনা অর্থাৎ জ্ঞানার্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা। কিন্তু তাদের একাংশ এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে। শুধু তাই নয়, তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে। ফলে, সাধারণ নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা বলতে গেলে জিম্মি হয়ে পড়ছে তাদের কাছে। একটি সভ্য ও স্বাধীন দেশে এই পরিস্থিতি কোনো কারণেই এবং কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।